তথ্য, উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রঃ ভারতের সীমান্ত অঞ্চল থেকে একটি পর্যবেক্ষণ

অঙ্কুশ আগরওয়াল ও বিকাশ কুমার

৯ নভেম্বর, ২০২০

এক দশকের অর্ধেকেরও কম সময়ের মধ্যে ভারতের অর্থনীতি পর পর তিনটি গুরুতর ধাক্কা খেয়েছে – উচ্চ এককের কাগজী মুদ্রা বাতিল বা ডিমনিটাইজেশন (২০১৬), পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) ব্যবস্থা আরোপে বিশৃঙ্খলা (২০১৭), এবং কোভিড-19 অতিমারী (২০২০)। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, সময় মতো দরকারী তথ্যের অভাব নীতিনির্ধারকদের কাজে পদে পদে বাধা দিয়েছে এবং সরকারী তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় মারাত্মক কিছু গলদকে চোখের সামনে এনেছে। কোভিড-19 অতিমারীর মোকাবিলায় সরকারের অপটু প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সংক্রমণ ও মৃত্যু ঘটেছে আর সেই ঘটনাগুলির বিবৃতি প্রকাশে অনেক সময় নেওয়া হয়েছে বা অসম্পূর্ণ বিবৃতি পেশ করা হয়েছে। এবং এই ত্রুটির ওজর হিসাবে অন্যান্য অনেক বিষয়ের পাশাপাশি সরকারের হাতে থাকা নিম্নমানের পরিযায়ী শ্রমিক ও অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের উপর দোষারোপ করা হয়। সম্প্রতি, এই বিবৃতি প্রকাশে বিলম্ব বা অসম্পূর্ণ বিবৃতি পেশের মতো ঘটনাগুলির কারণে কোভিড-19 নিয়ে সরকারী পরিসংখ্যানকে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

সরকার পক্ষের আলোচনা ও বিতর্ক সচরাচর আশু সংকটগুলিকে কেন্দ্র করেই ঘোরে এবং তার ফলে ভারতের ক্রমশ বাড়তে থাকা তথ্যের ঘাটতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটটি উপেক্ষিতই থেকে যায়। যেমন, কোভিড-19 সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের গুণমান নিয়ে প্রশ্নগুলিকে কোন রকম অনুষঙ্গ ছাড়াই উত্থাপিত হচ্ছে। জনগণনা, ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে (এনএসএস) এবং জাতীয় অ্যাকাউন্টের মতো সরকারের অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের ভান্ডারগুলিসহ তথ্যের ঘাটতি সংক্রান্ত যে বৃহত্তর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে এই দেশ, তার থেকে বিচ্ছিন্নভাবেই এই প্রশ্নগুলি উঠে আসে।

সরকারের পরিসংখ্যান পদ্ধতিকে তার বৃহত্তর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অনুষঙ্গে সনাক্ত করে তার (সরকারের) নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহের ক্ষমতাকে আমাদের বোঝা প্রয়োজন। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে মিজোরাম পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের সীমান্তবর্তী স্থলবেষ্টিত এবং অশান্ত অঞ্চলগুলি এই তথ্যের অনুষঙ্গকেন্দ্রিক গুণমানের উপর নির্ভরশীলতার উপযুক্ত উদাহরণ। অবস্থানের কারণে ভারতের অধিকাংশ সীমান্তবর্তী রাজ্যই সব দিক থেকে স্থলভাগ দিয়ে ঘেরা এবং গভীর জঙ্গল, দুর্গম উপত্যকা আর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাব ইত্যাদি নানা সমস্যার দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সমস্যাগুলি সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলির প্রসারেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার সুযোগের পাশাপাশি এমনকি দোকানবাজারে যাতায়াতও সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। এই ধরনের পরিকাঠামোগত প্রতিকূলতা এবং সীমিত রাজস্বের উৎস হওয়ার কারণে এই সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিকে বিশেষ মর্যাদা ধারা বা স্পেশাল ক্যাটেগরি স্টেটের মর্যাদা প্রদান করা হয় যার ফলে এই সেগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় সহায়তায় অগ্রাধিকারের যোগ্যতা লাভ করে।

বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্যে অগ্রাধিকার পাওয়া সত্ত্বেও সীমান্তের রাজ্যগুলি অনুন্নয়নের ধারা অব্যাহতই রয়ে গেছে। বস্তুগত পরিকাঠামোয় বিনিয়োগে অত্যুৎসাহী হয়ে নয়া দিল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষমতার উপরের স্তর থেকে নীচের স্তরে যাওয়ার যে পন্থা গ্রহণ করেছে তা প্রশাসনের উপরিতলার দুর্নীতিতে ইন্ধন যুগিয়েছে। এর ফলে যে স্থানীয় শিল্পোদ্যোগ ইতিপূর্বেই দূরত্ব ও বিদ্রোহের কারণে পঙ্গু হয়েছিল তা আরো কোণঠাসা হয়ে গেছে। এর ফলাফল হিসাবে, সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির করদাতাদের ক্ষেত্র ছোট হয়ে যায় এবং তারা অগ্রাধিকারভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্রীয় অনুদানের উপর নির্ভরশীল হয়েই থেকে যায়। সেই অনুদানও আবার ইতিমধ্যেই স্ফীতকায় নানা সরকারী উদ্যোগের খাতে চলে যায়। সরকারী উদ্যোগের বাইরে অন্য কোন কাজের সুযোগ না থাকায় রাজ্য সরকার বাধ্য হয় সরকারী ক্ষেত্রে চাকরির সংখ্যা বাড়িয়ে যেতে এবং তার ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীলতা তীব্রতর হতে থাকে। তবে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মী থাকা সত্ত্বেও সরকারী উদ্যোগগুলি কলেজ স্নাতকদের মধ্যে দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকা বেকারত্বের কোন সমাধান আনতে পারে নি।

এছাড়াও, সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে ধারাবাহিকভাবে গণতন্ত্রের ঘাটতি দেখা যায়। রাষ্ট্রের বৈধতাকে প্রশ্ন করে পরিচালিত নানা অমীমাংসিত বিদ্রোহ, জনমত ও সরকার-নিযুক্ত পরিষদগুলির বিরোধিতা সত্ত্বেও আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট বজায় রাখা, আইনবহির্ভূত হত্যার জন্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে জড়িত করা, দীর্ঘমেয়াদী তথ্য নিয়ন্ত্রণ এবং সামরিক, আধাসামরিক ও পুলিশ বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আর দেশের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমলাদের রাজপালের পদে নিয়োগের নীতির মধ্যে এই ঘাটতিরই প্রতিফলন দেখা যায়।

এছাড়াও, সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে আদমশুমারি ও জমি জরিপের ক্ষেত্রে নানা কৌশল প্রয়োগ, জরিপের প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্তকরণ এবং প্রত্যাহার করার নানা বিবৃতি পাওয়া গেছে। অনেক সীমান্তবর্তী রাজ্যেই এখনো পর্যন্ত কর ও মালিকানা নির্ধারণ এবং মানচিত্র তৈরির জন্য সঠিকভাবে জমির জরিপ করাই হয় নি। রাজনৈতিক অস্থিরতা (১৯৫১ সালে জম্মু ও কাশ্মীর), অসামরিক বিক্ষোভ (১৯৮১ সালে আসাম), এবং অভ্যুত্থানের (১৯৯১ সালে জম্মু ও কাশ্মীর) ফলে কখনো কখনো সীমান্তবর্তী অঞ্চলের আদমশুমারি বাতিল করা হয়েছে। ভারতের পারিবারিক স্তরের তথ্যের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস এনএসএস নিজেই কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীর এবং নাগাল্যান্ডের মত রাজ্য/যুক্তরাষ্ট্রের এমনকি প্রাথমিকতম আর্থসামাজিক সূচকের নমুনা হিসাবও দিতে পারছে না। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ভৌগোলিক দিক থেকে জমি জরিপের সুযোগ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে অনেক সময়ই সীমিত হয়ে পড়ে। এই রাজ্যগুলির জনসংখ্যা গোটা দেশের জনসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশ হলেও, অতীতে এনএসএসের শুমারি থেকে দেশের বাদ যাওয়া অংশের যে নমুনা হিসাব তার অর্ধেকেরও বেশি এসেছে এই রাজ্যগুলি থেকে।

তথ্যের ঘাটতির একটি কম পরিচিত দিক হল, যাঁরা সরকারী সহায়তার উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল তাঁরাই সরকারী পরিসংখ্যানে তথ্য বিকৃতি করেন। যে সরকারী সংস্থাগুলি প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে অনুদান বিতরণ করে সেগুলির প্রতি বিশ্বাসের অভাব এবং হিসাব করে তৈরি করা অসুবিধা ও অপর্যাপ্ততা ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে পাওয়া পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করেই নানা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে, আইন প্রণয়নকারী সভা বা লেজিস্লেচারে বেশি সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব পেতে এবং সরকারী অনুদানের বড় অংশ আয়ত্তে আনার জন্য নাগাল্যান্ড, কাশ্মীর এবং মণিপুরের কিছু অংশে ব্যাপকহারে আদমশুমারির তথ্য বিকৃত করার উদাহরণ পাওয়া গেছে।

অনুন্নয়নের কারণে সরকারের পক্ষে আদমশুমারি প্রক্রিয়ায় খুব বেশি বিনিয়োগ করাও সম্ভব নয় এবং সেই একই কারণে সরকারী অনুদানের একটা বড় অংশ অধিকারে আনতে তথ্য দেওয়ার সময় সংখ্যা বিকৃতি করা হয়। এই বিকৃতির ফলে তথ্যের মান নেমে যাওয়ায় নীতিনির্ধারণের পথে নানারকম বাধা তৈরি হয় ও উন্নয়নের কাজ ক্রমশ পিছিয়ে যেতে থাকে। অনুন্নয়নই আবার রাজনৈতিক অস্থিরতায় ইন্ধন জোগায় যা কিনা (বিধিসম্মত) গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করে দেয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা তথ্য সংগ্রহের কাজকে প্রভাবিত করে এবং আদমশুমারিসহ সরকারের অন্যান্য নানা জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন করে। আবার, তথ্যের ঘাটতির কারণেই যে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষমতা বন্টন ও সহায়তা দান করে সেগুলির প্রতি বিশ্বাসও ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকে যার ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়েই চলে।

এই ভাবেই সীমান্ত অঞ্চল এই তথ্য, উন্নয়ন আর গণতন্ত্রের ঘাটতির জালের জটিল বুনটে ক্রমাগত আটকে যেতে থাকে। দেশের বাহ্য সীমান্ত থেকে সরে এসে আভ্যন্তরীণ উপান্তের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে সেই অঞ্চলগুলিতেও সরকারী পরিসংখ্যান একই সমস্যায় ভুগছে। এই আভ্যন্তরীণ উপান্ত অর্থাৎ বস্তি এবং মধ্য ভারতের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল দেশের জনসংখ্যা এবং ভূমির অনেকটা অংশই জুড়ে আছে।

ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রমাণনির্ভর নীতিনির্ধারণের জন্য যে তুমুল কোলাহল শুরু হয়েছে এবং ক্রমশ বাড়ছে সেই কোলাহল সরকারী পরিসংখ্যানের নিম্নমানকে উপেক্ষা করে। যেহেতু তথ্যের ঘাটতির সঙ্গে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের খামতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাই শুধুমাত্র উন্নততর তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি চালু করে এবং সংগৃহীত তথ্য নিয়ে কাজ করার জন্য নানা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের আয়োজন করে যান্ত্রিকভাবে তথ্যের মান উৎকর্ষসাধনের প্রচেষ্টা করলেই হবে না। কাকতালীয়ভাবে, ভারত সরকারের প্রচলিত (ট্র্যাডিশনাল) ডেটাবেস যে সব ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ, তার ডিজিটাল ডেটাবেসও ঠিক সেই সেই ক্ষেত্রেই সমস্যাসঙ্কুল। অতএব,

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী না করে এবং তথ্যের ঘাটতির দিকে মনোযোগ না দিয়েই, পরিসংখ্যানগত ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করার জন্য শুধু মাত্র প্রযুক্তি, আইন ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সমাধান আনলে তার সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

তথ্যের অধিকার বা রাইট টু ইনফর্মেশনকে শক্তিশালী করতে এবং বিচার বিভাগ, সংবাদ মাধ্যম এবং কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি)-এর মত প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতাকে সংস্কারের জন্য দীর্ঘকালীন সংশোধনের প্রয়োজন। সরকারের পরিসংখ্যান প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপরিহার্য। অন্য দিকে, বিক্ষোভের শান্তিপূর্ণ সমাধান, যে ধরনের প্রশাসনিক সংস্কার পরিসংখ্যান পরিচালনাকারী সংস্থাগুলি সহ নানা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রণালীর উন্নতিসাধন করে সেই সংস্কারগুলির সূচনা করা, নির্বাচন প্রক্রিয়ার পরিমার্জনা, রাজস্ব সংগ্রহ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। এই পদক্ষেপগুলি নিলে, তবেই সরকারের পরিচয় এক নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার উপর মানুষের বিশ্বাস ফিরে আসবে।

সঙ্গতির অভাবে বর্তমান পরিসংখ্যান পরিচালক সংস্থাগুলিকে ঢেলে সাজানো কঠিন। তাই সরকারের পক্ষ থেকে যে গভীর ও ব্যাপকতর সংস্কারের প্রচেষ্টা চলছে তার পাশাপাশি পরিসংখ্যানগত অডিটের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে পরিসংখ্যান প্রক্রিয়ার ক্রমবর্ধমান সংশোধনেরও প্রয়োজন আছে। প্রথমত, তত্ত্বের প্রয়োজনে কাঙ্খিত বা অ্যাকাডেমিক দিক থেকে কার্যকর এমন পরিবর্তনপ্রবণ তথ্যের ভাণ্ডার তৈরির বদলে পরিসংখ্যান পরিচালনার আধিকারিকদের বরং উচিত তাঁদের কাজকর্মকে নিজেদের সংবিধানপ্রদত্ত, পরিসংখ্যানের কাজ সংক্রান্ত এবং কর্মপন্থানির্ভর দায়িত্বপালনেই সীমাবদ্ধ রাখা। দ্বিতীয়ত, আগে পরিসংখ্যান প্রক্রিয়ার বিশদ ব্যাখ্যা করে বর্ণনামূলক বিবৃতি প্রকাশ করা হত এবং তার ফলে তথ্যের বৃহত্তর প্রেক্ষিতটি বোঝা সম্ভব হত। পরিসংখ্যান আধিকারিকদের উচিত সেই পুরানো রীতিটিকে আবার শুরু করা। তৃতীয়ত, রাজনীতিবিদদের পক্ষে অসুবিধাজনক তথ্যগুলি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে প্রকাশ করতে দেরি হয়। এই হস্তক্ষেপের মাত্রা কমাতে পরিসংখ্যান পরিচালনার আধিকারিকদের উচিত চূড়ান্ত তথ্য প্রকাশের আগেই তালিকা তৈরির পরিকল্পনা এবং একটি সময়সারণী প্রকাশ করা। সব শেষে, পরিসংখ্যান প্রক্রিয়ার কর্মকর্তা এবং তথ্যের ভাণ্ডারের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে জড়িত অংশীদারের মধ্যে আরো বেশি যোগাযোগ প্রয়োজন। সরকারের সর্বব্যাপী প্রচার শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোন রকম সাড়া না পাওয়া বা জরিপের জায়গায় কাজে বাধা পাওয়ার মত ঘটনাগুলিকেই সম্বোধন করবে না, সেগুলির পাশাপাশি এই ধরনের প্রচার প্রকাশিত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতারও উন্নতিসাধন করবে।

অঙ্কুশ আগরওয়াল ও বিকাশ কুমার যথাক্রমে দিল্লির ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি এবং বেঙ্গালুরুর আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক। তাঁরা ২০২০ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত *নাম্বারস ইন ইন্ডিয়া'স পেরিফেরিঃ দ্য পলিটিকাল ইকোনমি অফ গভর্নমেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স* বইটির সহলেখক।